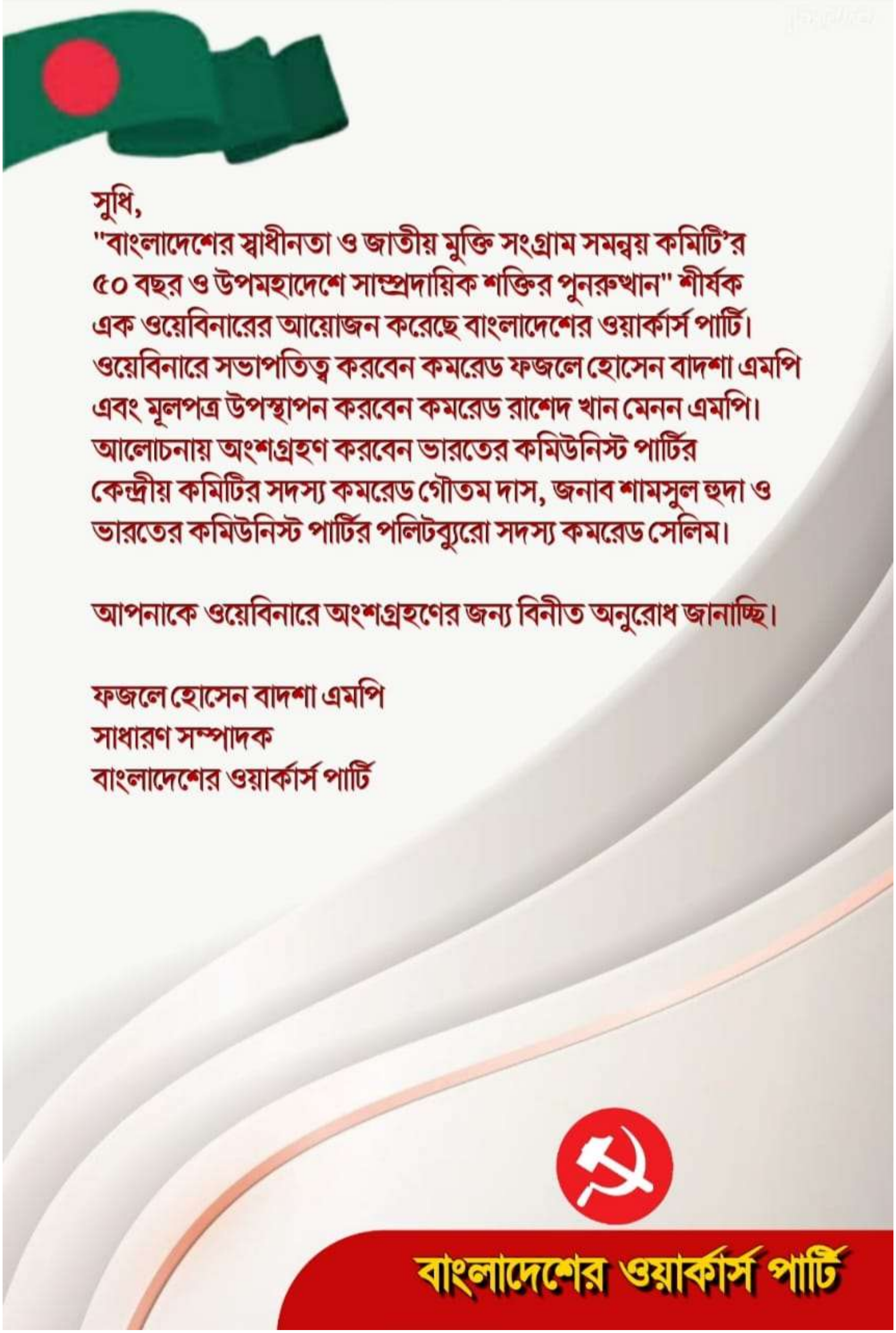

সুধি,

"বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'র ৫০ বছর ও উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির পুনরুত্থান" শীর্ষক এক ওয়েবিনারের আয়োজন করেছে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি। ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করবেন কমরেড ফজলে হোসেন বাদশা এমপি এবং মূলপত্র উপস্থাপন করবেন কমরেড রাশেদ খান মেনন এমপি। আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড গৌতম দাস, জনাব শামসুল হুদা ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড সেলিম।

আপনাকে ওয়েবিনারে অংশগ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

ফজলে হোসেন বাদশা এমপি
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

(বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি আয়োজিত “বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ৫০ বছর ও উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির পুনরুত্থান” শীর্ষক ওয়েবিনারের মূলপত্র হিসেবে উপস্থাপিত)

।। রাশেদ খান মেনন ।।

এবছর বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপিত হচ্ছে।এই উদযাপনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমধারা এবং ঐ স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বদানের বিষয়টি সঠিকভাবে উপস্থাপিত হলেও ঐ স্বাধীনতা লড়াইয়ে বামপন্থীদের ভূমিকার বিষয়টি অনুল্লেখিতই থেকে গেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ ও তার প্রাক-পর্বে বামপন্থীদের যে বলিষ্ঠ এবং এক পর্যায়ে অগ্রগামী ভূমিকা ছিল তা কেবল অনুল্লেখিতই নয়, অস্বীকৃতও বটে।তবে কোনো কালের কোনো ইতিহাস কেউ মুছে ফেলতে পারেনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের কথা জনগণকে ভুলিয়ে দেয়ার যে ক্ষমাহীন অপচেষ্টা হয়েছিল তাকে ভেদ করে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকালেই নয় এই সর্বসময়ে তা ঐ বিভ্রান্তি, বিকৃতি ছাপিয়ে উঠে এসেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থী ধারার উপস্থিতি, প্রাক-পর্বে তাদের অগ্রগামী ভূমিকাকে তাই যতই উল্লেখ বা স্বীকার করা নাহোক তাও যে একসময় দেশবাসী শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে, সেটিও আমোঘ সত্য।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে ১৯৭১-এর ২রা জুন ছিল একটি অনবদ্য দিন। এদিন এদেশের বামপন্থীরা মুক্তিযুদ্ধকালে বামমহলে যে বিভ্রান্তি ছিল তাকে কাটিয়ে উঠে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি গঠন করেছিল।এই কমিটি যেমন একদিকে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিল, তেমন ভারতের মাটিতে ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শত প্রতিকূলতা কাটিয়ে দেশের চৌদ্দটি জায়গায় নিজস্ব লড়াই পরিচালনা করেছিল, দেশের অভ্যন্তরেই মুক্তাঞ্চল গঠন করেছিল। পাশাপাশি প্রতিটি সেক্টরে সেক্টর কমান্ডারদের অধীনে যে সকল বাহিনী গড়ে উঠেছিল তাতেও এই কমিটির অনুসারীরা কেবল অংশগ্রহণই করে নাই, পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকারদের সাথে লড়াইয়ে সাহস ও দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় দিয়েছে, হাসিমুখে শাহদাত বরণ করেছে।এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আগরতলার মেলাঘরে যে মুক্তিযোদ্ধারা প্রশিক্ষণ নিয়েছিল, ২ নম্বর সেক্টরসহ ঢাকা মহানগরে পাকিদের ব্যতিব্যস্ত রাখতে, রুখে দিতে যারা অংশ নিয়েছিল তারা এই বামপন্থী কর্মীবাহিনীর অংশ ছিল।আর এটা সে সময়ের আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে এমনই ক্ষুদ্ধ করেছিল তারা সেনা সদরকে দিয়ে সেটা ভেঙ্গে দিতে চেয়েছে।

সে যাই হোক স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের সময়কালে এই ‘জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটির’ও পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হচ্ছে।সুবর্ণ জয়ন্তীকালে এই ‘জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি’র প্রধান মওলানা ভাসানীর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।বস্তুত পাকবাহিনীর হাতে টাঙ্গাইল পতনের দিন ৩ এপ্রিল’৭১ নরসিংদীর শিবপুর, থেকে ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জ ঘুরে আমি আর বন্ধু সহকর্মী রনো মওলানা ভাসানীর কাছে তার বিন্নাফৈরের অবস্থান স্থলে পৌঁছুলে তিনি প্রথমে যে কথাটি আমাদের

বলেন তা’ হলো পাক-বাহিনীর সাথে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়তে দেশের সকল বামপন্থীদের সাথে যোগাযোগ করা।আর তার দ্বিতীয় কথা ছিল জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্টসহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে অবিলম্বে বার্তা প্রেরণের। তিনি ঐ রাতেই আমাকে ও রনোকে ঐ বার্তা লেখার জন্য বলেন। কিন্তু পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর ঐ আক্রমণের অবস্থায় ঐ বার্তা কিভাবে পাঠাব ভেবে আমরা কুল পাইনি। তাকে বরং আমরা ভারতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করি।আমার ‘একজীবন’ প্রথম পর্ব ও রনোর ‘শতাব্দী পেরিয়ে’ বইয়ে এ বিষয়ে মওলানা ভাসানীর যে উত্তর ছিল তা আমার লিখেছি। তিনি বলেছিলেন, ইন্দিরা জওহরলালের মেয়ে। জওহরলাল আমার বন্ধু ছিল। ভারতে গেলে ওরা আমার মাথায় করে রাখবে।কিন্তু সুভাষ বোসের অবস্থা দেখনি? সে দেশে ফিরতে পারে নাই।ঐ বইতেই আমরা উল্লেখ করেছি পরদিন সকালে পাক-বাহিনী সন্তোষে মওলানা ভাসানীর বাড়ী আক্রমণ করে ও সন্তোষের দরবার হলে আগুন দিলে মওলানা ভাসানী রাস্তার উপর গিয়ে সেটা দেখার কথা বলেন।কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে আমরা দেখি মওলানা ভাসানী নেই পিছনের ধান ক্ষেতে দূরে তার অপসৃয়মান অবয়ব দেখা যাচ্ছিল।

মওলানা ভাসানী টাঙ্গাইল থেকে নদীপথে সিরাজগঞ্জ হয়ে আসাম দিয়ে ভারত প্রবেশ করেন। সিরাজগঞ্জ থেকে সাথী হিসাবে ভাসানী ন্যাপের মুরাদুজ্জামান ও ওয়ালী ন্যাপের সাইফুল আলমকে নৌকায় তুলে নেন।মওলানা ভাসানী আসামে পৌঁছুলে আসামের কর্তৃপক্ষ তাকে সাদরে স্বাগত জানায় এবং ভারতের তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও পরবর্তীতে ভারতের রাষ্ট্রপতি, আসামের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ফখরুদ্দীন আলী আহমেদ সাহেব তাকে দিল্লী নিয়ে যান।বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নয়মাসে ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার তাকে আর জনসমক্ষে আসতে দেয়নি।তারা তাকে নিরাপত্তা হেফাজতে বিভিন্ন সময় ভারতের বিভিন্ন জায়গায় রাখেন। তবে এই সময়কালেও মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ন্যায্যতার কথা বলে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্ট, চীনের চেয়ারম্যান মাও জে দং প্রমুখের কাছে বার্তা পাঠান যা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার সে দেশের গণমাধ্যমে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে।এভাবে মওলানা ভাসানীর বার্তা-বিবৃতি ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হলেও মওলানা ভাসানী কোথায় কিভাবে অবস্থান করছেন তা রহস্যজনকই রয়ে যায়।পশ্চিমবাংলা রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দল নেতা সিপিআই(এম)-এর কমরেড জ্যোতিবসু এ ব্যাপারে ভারত সরকারকে বারবার প্রশ্ন করেও জবাব পাননি। মওলানা ভাসানীকে হারিয়ে টাঙ্গাইল থেকে আমি নরসিংদীর শিবপুরে ‘কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি’র মুক্তিযুদ্ধের হেড কোয়ার্টারে এসে জানতে পারি যে সমন্বয় কমিটির নেতা কাজী জাফর আমার জন্য খবর রেখে গেছেন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা দেবেন শিকদার জানিয়েছেন যে এপ্রিলের ২৯ তারিখ জলপাইগুড়িতে বামপন্থী দলসমূহের এক বৈঠক হবে।সেখানে মওলানা ভাসানী আসবেন।আমি আর রনো যেন খবর পাওয়ামাত্র আগরতলায় গিয়ে সেখানকার সিপিআই (এম) নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ করি। তারা আমাদের সেখানে পৌঁছে দেবেন।তিনি শ্রমিক নেতা আবুল বাশারকে নিয়ে জলপাইগুড়ি বৈঠকে যোগ দিতে চলে যান।আমার ইতিমধ্যে দেরী হয়ে যাওয়ায় ১লা মে কুমিল্লার চিওড়া হয়ে আগরতলা পৌঁছাই।ইতিমধ্যে ঐ বৈঠকের তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ায় আমি পরবর্তী খবরের জন্য আগরতলায় অপেক্ষায় করতে থাকি। পরে জানতে পারি যে নির্ধারিত সময় বামপন্থীদের ঐ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও মওলানা ভাসানী সেখানে উপস্থিত হননি বা তাকে উপস্থিত হতে দেয়া হয় নি।ন্যাপ নেতা মশিউর রহমানকে তার বন্ধু পশ্চিম বাংলার উপমুখ্যমন্ত্রী ত্রিগুনা সেন কথা দিয়েছিলেন যে তিনি ভারত সরকারকে বলে মওলানা ভাসানীকে

ঐ বৈঠকে উপস্থিত হবার ব্যবস্থা করে দেবেন।মওলানা ভাসানী ঐ বৈঠকে উপস্থিত না হওয়ায় সেখানে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।অন্যদিকে ন্যাপ নেতা মশিউর রহমান তার ক'দিন পর সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে ফিরে যান ও পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

এদিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) সহায়তায় আমরা দেশের সকল বামপন্থী দল ও গ্রুপগুলির সাথে যোগাযোগ করি।কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট (এম-এল) যার নেতা ছিলেন মহম্মদ তোয়াহা-আবদুল হক-সুখেন্দু দস্তিদার, তারা চারু মজুমদারের নেতৃত্বাধীন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র লাইন অনুসারে আগেই শ্রেণীশত্রুখতমের লাইন গ্রহণ করেছিল।তারা ইতিমধ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ঐ সিপিআই(এম-এল) এর মূল্যায়ন অনুযায়ী 'দুই কুকুরের কামড়াকামড়ি' বলে অভিহিত করে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছে।অপরদিকে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (মতিন-আলাউদ্দিন) প্রথম দিকে পাবনা অঞ্চলে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে বীরোচিত লড়াই করলেও তারাও কিছুদিনের মধ্যে একই পথ নেয়।

এই অবস্থায় একদিকে মওলানা ভাসানীর হদিস পাওয়া যাচ্ছে না, অন্যদিকে এই সকল বামদলগুলির মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অবস্থান বামপন্থীদের জন্য এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করে।আমরা যারা (কমিউনিস্ট) বিপ্লবীদের 'পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি' গঠন করেছিলাম তারা ১৯৭০-এর ২২ শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) গ্রুপের শহীদ দিবসের জনসভায় 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার' ঘোষণা দিয়ে এহিয়ার সামরিক আদালতের দণ্ডাদেশ লাভ করি।এ অবস্থায় আত্মগোপনে আমরা স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র লড়াইয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকি।তবে ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের রাতে গণহত্যার প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী যে প্রচণ্ডতা নিয়ে আক্রমণ শুরু করে ঐ পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের কোন সম্যক ধারণাই ছিল না।তারপরও ২৫ মার্চের কালো রাতের পর কার্ফু উঠে গেল আমরা ঢাকার অদূরে নরসিংদীর শিবপুরে ঘাঁটি তৈরী করে প্রতিরোধ লড়াই শুরু করেছিলাম। ভারতের বিভিন্ন সেক্টরে বিশেষ করে আগরতলার মেলাঘর, নির্ভয়পুর প্রভৃতি ক্যাম্পে থেকে আমাদের কর্মীরা মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেয়া শুরু করে।ঢাকা থেকে পালিয়ে আসা বিডিআর পুলিশের ফেলে যাওয়া অস্ত্র আমাদের প্রথম অস্ত্র ছিল।এভাবে দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির' কর্মীরা শিবপুর ছাড়াও উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর, রংপুরে, বরিশাল, পিরোজপুর, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও সিলেটে মুক্তিযুদ্ধের কার্যক্রম শুরু করেছিলাম।প্রয়োজন ছিল এর আনুষ্ঠানিক সাংগঠনিক রূপ দিয়ে সমস্ত লড়াইকে ঐক্যবদ্ধ করা।

এই ক্ষেত্রে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ নেতৃবৃন্দের পরামর্শে জুন মাসের ১লা ও ২রা তারিখ কলকাতায় মুক্তিযুদ্ধরত সকল বামপন্থী শক্তিকে নিয়ে বৈঠকের আয়োজন করি। এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) প্রবীণ নেতৃবৃন্দ আমরা কি নীতি বা কৌশল নেব, কোন সাংগঠনিক পদক্ষেপ নেব সে সম্পর্কে কোন মতামত দিতে সবসময় বিরত থাকতেন।তাদের কথা ছিল তারা তাদের ও অন্য দেশের বিভিন্ন লড়াই ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারেন।কিন্তু আমরা কি করব সেটা আমাদেরই নির্ধারণ করতে হবে।তবে আমাদের কাজ এগিয়ে নিতে সর্বপ্রকার সাংগঠনিক ও আর্থিক সহায়তা তারা প্রদান করেছিলেন। কমরেড জ্যোতিবসুর নেতৃত্বে সিপিআই(এম) ইতিমধ্যে 'বাংলাদেশ সহায়তা তহবিল' গড়ে তুলেছে।

ঐ নেতৃবৃন্দের বক্তব্য ছিল ভারত সরকারতো প্রবাসী সরকারকে ও মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করছে। আমাদের সংগৃহীত এই অর্থ বামপন্থীদের কাজে লাগুক। ভারতের কলকাতায় অবস্থানরত ভাসানী ন্যাপসহ বিভিন্ন বামপন্থী গ্রুপের মধ্যে আলোচনা করে কলকাতায় বামপন্থীদের কর্তব্যকর্ম নির্ধারণ ও তাদের পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধকে একটি সাংগঠনিক কাঠামোয় আনার জন্য ১লা ও ২রা জুন এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।সিপিআই(এম) বেলেঘাটার এক স্কুলে ঐ বৈঠকের ব্যবস্থা করে দেন। খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে বৈঠকের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব সিপিআই(এম) -এর স্থানীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এর কারণ ছিল একদিকে ভারত সরকার বাম-কমিউনিস্টদের মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা নিয়ে সন্দিহান ছিল, তাই তারা সর্বদা তাদের নজরদারিতে রেখেছিল।অন্যদিকে নকশালরা, যারা কলকাতার বিভিন্ন এলাকা নিয়ন্ত্রণ করত, তারা মুক্তিযুদ্ধের বৈরী ছিল।

দিনাজপুরের প্রবীণ ভাসানী ন্যাপ নেতা এ্যাডভোকেট বরদা চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে ভাসানী ন্যাপ, কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (দেবেন শিকদার), শ্রমিক-কৃষক কর্মী সংঘ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পাটির্ (হাতিয়ার), পূর্ব বাংলা কৃষক সমিতি, পূর্ব বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন (পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন) এবং পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।২রা জুন সম্মেলন সর্ব সম্মতিক্রমে মওলানা ভাসানীকে প্রধান করে ‘জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি’ গঠন করে এবং একটি ঘোষণা গ্রহণ করে। ঘোষণার সূত্রপাতে বলা হয় “সম্প্রতি মওলানা ভাসানী ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে অগ্রসর করিয়া লওয়ার জন্য যে আহ্বান ও নির্দেশ দিয়াছেন তাহাকে অবলম্বন করিয়া.... রাজনৈতিক ও গণসংগঠনের প্রতিনিধিরা এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া ‘জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি’ গঠন করিয়াছেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত ঘোষণা প্রণয়ন করিয়া বাংলাদেশের জনগণের নিকট উপস্থিত করিতেছেন।”

ঘোষণায় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলা হয় “... এই সমন্বয় কমিটির আশু লক্ষ্য হইল সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের সরকার ও মুক্তিসংগ্রামের সকল শক্তির সহিত সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধকে সাফল্যের পথে অগ্রসর করিয়া লওয়া।” ঘোষণায় জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে সফল করার জন্য আওয়ামী লীগসহ সকল রাজনৈতিক দল, গ্রুপ, গণসংগঠন, শ্রেণী সংগঠন ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে একটি ‘জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট’ গঠনের আহ্বান জানান হয়।

সমন্বয় কমিটি গঠনের এক কি দু’দিন পর দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের সামনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সমন্বয় কমিটি গঠন ও তার ঘোষণার কথা প্রকাশ করা হয়।জনাকীর্ণ ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে অনেক প্রশ্নের মধ্যে প্রধান প্রশ্ন ছিল এটা প্রবাসী সরকারের বিকল্প কোন সংগঠন কিনা। সংবাদ সম্মেলনে পরিস্কার করা হয় যে সমন্বয় কমিটি প্রবাসী সরকারকে সহযোগিতার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধে সকল মত পথ, সংগঠন ও ব্যক্তির ঐক্যবদ্ধ করা ও তাদের সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতেই সমন্বয় কমিটি গঠন ও তার ঘোষণা গ্রহণ করেছে। সম্মেলনের সংবাদ আনন্দবাজার থেকে ভারতীয় সকল পত্রিকা ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে গুরুত্বের সাথে প্রচার করা হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) মুখপত্র গণশক্তিতে সমন্বয় কমিটির ঘোষণা পূর্ণ পৃষ্ঠা ব্যাপী ছাপা হয়।

সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি পক্ষ থেকে কাজী জাফর আহমদ ও হায়দার আকবর খান রনো বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের সাথে দেখা করে তাকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি গঠন, বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারকে সহযোগিতা, জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনসহ সম্মেলনের সকল সিদ্ধান্ত অবগত করেন।কিন্তু তিনি ইতিবাচক সাড়া না দিয়ে বরঞ্চ মুক্তিযুদ্ধে বাম কমিউনিস্টদের একাংশ অর্থাৎ নকশালপন্থীদের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কর্মকান্ড সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করেন। তাকে বলা হয় যে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন এই কমিটি নকশালদের ঐ সকল কর্মকান্ডের বিরোধিতা করে এবং তার সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই।এক সময় কিছুটা উত্তপ্ত বিতর্ক হলে আবদুস সামাদ আজাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্তI হয়। তবে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন জানান যে তিনি ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর সাথে কথা বলে এ ব্যাপারে জানাবেন।সম্ভবত তিনি 'জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম কমিটি' ভবিষ্যতে প্রবাসী সরকারের বিকল্প হয়ে উঠতে পারে এই অনুমান করেছিলেন। আর ইতিমধ্যে দলের অভ্যন্তরে আওয়ামী লীগের তরুণ নেতৃত্ব তার সরকারের বিরোধিতায় ভারতীয় সেনা বাহিনীর সহায়তায় মুক্তিবাহিনীর সমান্তরাল 'মুজিব বাহিনী' গড়ে তোলার যে উদ্যোগ নিয়েছে তা নিয়ে বিব্রত ছিলেন। দলের নেতৃত্বের একাংশ বিশেষ করে খন্দকার মোশতাক প্রথম থেকেই স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে সংশয় সৃষ্টি করে চলেছিল।

প্রবাসী সরকারের এ ধরণের অসহযোগিতার মনোভাবের কারণে মুক্তিযুদ্ধের নয়মাসে তাদের সাথে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির আর যোগাযোগ হয়নি।একদিকে প্রবাসী সরকারের এ ধরণের অস্বীকৃতি ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বৈরী মনোভাবের কারণে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটিকে এক বড় ধরনের প্রতিকূল অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে নিজেদের ভূমিকা রাখতে হয়।দেশের ১৪টি অঞ্চলে নিজেদের বাহিনীর নেতৃত্বে পাকবাহিনী ও রাজাকার বাহিনীকে মোকাবেলা করা প্রতিরোধ লড়াইয়ের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।এর বাইরে মুক্তিবাহিনীর সেক্টর কমান্ডারদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের অধীনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ, মুক্তিবাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত হয়ে বিভিন্ন লড়াইয়ে অংশগ্রহণের কাজকেও এগিয়ে নেয়।এই অবস্থা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ভারতীয় গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ কাজী জাফর ও হায়দার আকবর খান রনোকে দু'দিন অনর্গল জেরার মাধ্যমে 'জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার চেষ্টা করে।তারা শেষ পর্যন্ত জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটিকে অর্থ ও অস্ত্র দিতে রাজি হয়।তবে কমিটি অর্থ প্রদানের প্রস্তাব গ্রহণ না করে অস্ত্র প্রদানের উপর জোর দেয়।

ইতোমধ্যে মুক্তিযুদ্ধ শেষ প্রান্তে চলে এসেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বব্যাপী তার কূটনৈতিক সফর শেষে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিতে মোটামুটি মানসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই প্রেক্ষাপটে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিয়ে মওলানা ভাসানীকে প্রধান করে প্রবাসী সরকারের উপদেষ্টামন্ডলী গঠন করে।এটা ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বামদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে একমাত্র স্বীকৃতি।উপদেষ্টামন্ডলী গঠনের উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দলই যে একমত সেটা বিশ্বকে দেখানো।

মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ঐ উপদেষ্টামণ্ডলীর একটি মাত্র সভা হয়, যার সচিত্র প্রতিবেদন ভারতের গণমাধ্যমসমূহে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়।অবশ্য ইতোপূর্বে মওলানা ভাসানী তার ভারত প্রবাসের সাথী সাইফুল ইসলাম ও মুরাদুজ্জামানকে কাজী জাফর ও আমার কাছে পাঠানো এক চিঠিতে পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া মুক্তিযুদ্ধে কোন ধরণের আপোসের কথা উঠলে তার বিরোধিতা করতে বলেন। কারণ ইতোমধ্যে পাকিস্তানের সাথে কনফেডারেশন গঠনের মধ্য দিয়ে একটা আপোস মীমাংসার প্রস্তাব খন্দকার মোস্তাকরা এনেছিল। সেই উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেয়া হলেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এহেন উদ্যোগ থেমে ছিল না।মওলানা ভাসানী আমাদের কাছে পাঠানো চিঠি শেষ করেছিলেন রবি ঠাকুরের পংক্তি দিয়ে, “যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে।”

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ড গঠন ও পাক-ভারত যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অতিদ্রুত সময়ে বিজয়ের প্রান্তে উপনীত হয়।জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটির অধীনস্ত সকল বাহিনীই এই সময়ে বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের স্বাক্ষর রাখে। ক্ষেত্র বিশেষে যৌথ বাহিনীর পৌঁছার পূর্বেই পাকিস্তানি বাহিনীর ঘাঁটির পর ঘাঁটির পতন ঘটায়।

ষোলই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি ষোলই ডিসেম্বর ’৭১ মুক্তিযুদ্ধের সফল সমাপ্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করে সামনের দিনে কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে এক দিক নির্দেশক বক্তব্য প্রদান করে।বিবৃতির শেষে বলা হয়, “আজকের এই মুহুর্তে আমাদের বিশেষ কাজটি রহিয়াছে তাহার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের এবং সমগ্র জনগণের একতার প্রয়োজনীয়তা পূর্বের চাইতেও বেশী।সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার ষড়যন্ত্র ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ প্রতিহত করা, স্বাভাবিক অবস্থার প্রবর্তন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক জীবন চালু করিবার জন্য সকল গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে আমরা সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করিবার জন্য আহবান জানাইতেছি।সরকারের উদ্যোগে যে সকল গণকমিটি গঠিত হইবে তাহাতে সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দল ও মতের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করিতে হইবে।আমরা সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠনের কর্মীদেরকে এই প্রাথমিক গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করা, জনগণের মধ্যে ব্যাপক ঐক্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং এই ব্যাপারে সরকারের সাথে সক্রিয় সহযোগিতা করিবার জন্য আহবান জানাইতেছি।”

জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সমন্বয় কমিটির সহযোগিতার প্রস্তাব যেমন প্রবাসী সরকার গ্রহণ করেনি, তেমনি বাংলাদেশ সরকারও সমন্বয় কমিটির এই আহ্বানে কান দেয়নি। বাংলাদেশ পরবর্তীতে পাকিস্তান আমলের পুরানো রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো পুণঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সে একই রাজনীতির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে নব্যস্বাধীন বাংলাদেশে।আর তারই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় গণবিরোধী শক্তি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জাতির পিতাকে সবংশে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করেছে।বাংলাদেশ পিছিয়ে গেছে মুক্তিযুদ্ধের পথ থেকে বহুদূর, যারই ধারাবহিকতা বহন করতে হচ্ছে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর সুবর্ণজয়ন্তীতেও।

॥ ২ ॥

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপমহাদেশের রাজনীতির এক অনন্য দিন।মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রের অভ্যুদয় দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে উপমহাদেশের বিভাজনকে সমূলে আঘাত করেছিল।ঐ রাজনীতিকে পরাজিত করে কৃত্রিম পাকিস্তান রাষ্ট্রের পতন ঘটিয়ে পাকিস্তানের পূর্বাংশে বাঙালির জাতি রাষ্ট্র কায়েম করেছিল।

কিন্তু দ্বি-জাতিতত্ত্বের রাজনীতিকে মর্মমূলে আঘাত করা গেলেও ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে সমূলে উৎপাটন করা যায় নাই।বাংলাদেশ জাতি রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা সম্ভব না হলেও সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবাষ্প উপমহাদেশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার পরিপূর্ণ অবসান ঘটানো সম্ভব হয় নাই।সাম্প্রদায়িকতার আর্থসামাজিক ভিত্তিকে অটুট রেখে এটা সম্ভবও ছিল না।

পাকিস্তানের কারগার থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু তার প্রথম বক্তৃতাতেই স্পষ্টভাবে বলেন যে, জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় মুসলিম রাষ্ট্র হলেও বাংলাদেশ কোন ধর্মীয় রাষ্ট্র হবে না, বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খৃষ্টান সকল ধর্মের মানুষের সমান অধিকার থাকবে।বাংলাদেশে ধর্মের রাজনীতির কোন জায়গা হবে না।

বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটে বাংলাদেশের সংবিধানে।সংবিধানের চার মূলনীতিতে যুক্ত করা হয় ধর্মনিরপেক্ষতার বিধান।সংবিধানের বিধানে সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞাকেও সুনির্দিষ্ট করা হয়।ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলগঠন ও তাদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কার্যকলাপকে নিষিদ্ধ করা হয়।

সংবিধানে বঙ্গবন্ধু এই বিধান সংযোজন সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় বিভাজনের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অবস্থান নিলেও নতুন বাংলাদেশ রাষ্ট্রেও অতীতের সাম্প্রদায়িকতার অন্তঃস্রোত বিরাজমান ছিল।বঙ্গবন্ধুর প্রবল ব্যক্তিত্বের কাছে এই সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক ধ্যান-ধারণা দাঁড়াতে না পারলেও বাংলাদেশ পরবর্তীতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, বাংলাদেশের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা জনগণ সেভাবে গ্রহণ করতে পারেনি।এদিকে অতি ডান অতি বাম উভয় পক্ষ থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ভারতের দখলদারিত্বের সাথে তুলনা অপপ্রচার ভারতের বিরুদ্ধে জনমনে বিরূপতা সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত পাকিস্তান ও তাদের এদেশীয় সহযোগীরা চুপ করে বসে থাকেনি। তারা বাংলাদেশকে ‘মুসলিম বাংলা’ হিসাবে অভিহিত করে প্রচার চালায়।

এদিকে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক কাঠামোতে কোন পরিবর্তন আসেনি বরং পুরাতন ব্যবস্থায়ই নতুন বাংলাদেশে পুনঃস্থাপিত করা হয়।বামসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জাতীয় ঐক্যের ডাক মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেও যেমন প্রত্যাখাত হয়েছে, এখনও আবার প্রত্যাখ্যাত হয়।দলবাজি,

দুর্নীতি, লুটপাট জনগণের নিয়তি হয়ে দাঁড়ায়।বঙ্গবন্ধুর আহবানে মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র সমর্পণ করলেও বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির হাতে বহু অস্ত্র রয়ে যায়। অতিবামদের তরফ থেকে অব্যাহতভাবে বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বের অস্বীকৃতি, সশস্ত্র লড়াই, থানা লুট, ব্যাংক লুটের ঘটনা দেশে স্থিতিশীলতা আনার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিশেষ করে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি একটা বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।এই অবস্থায় ওআইসি সম্মেলনকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশ ও মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্ক স্বাভাবিক করণের পরও সৌদী আরব বাংলাদেশকে তার ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থান থেকে সরে আসতে স্বীকৃতির শর্ত হিসাবে উপস্থিত বাংলাদেশ কিছুটা চাপের মুখে ছিল।সৌদী আরবকে কেন্দ্র করে জামাতের নেতৃত্বে স্বাধীনতা বিরোধীরা তাদের বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা অব্যাহত রাখে।

দেশের অভ্যন্তরে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে ভারতের কথিত পরামর্শে বাংলাদেশ সরকার প্যারা-মিলিটারি বাহিনী-রক্ষীবাহিনী গঠন করে।রক্ষীবাহিনীর আচরণেই সরকার ও সরকারী দলের নির্যাতন নিপীড়নের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। রক্ষীবাহিনীর সাথে ভারতের বিএসএফ-এর পোশাকের মিল থাকায় অনেকেই রক্ষীবাহিনীকে ভারতের পরোক্ষ বাহিনী হিসাবে গণ্য করতে থাকে। এ নিয়ে ব্যাপক প্রচারও চলে।সেনাবাহিনীসহ পুলিশ-বিডিআর রক্ষীবাহিনীকে তাদের প্যারালাল বাহিনী হিসাবে মনে করতে থাকে।

এই সময় বাংলাদেশে উপুর্যপুরি বন্যার কারণে দেশে তীব্র খাদ্যাভাব সৃষ্টি হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সুযোগে কিউবায় মার্কিন নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বাংলাদেশ পাট রপ্তানী করার শাস্তি হিসাবে পিএল ৪৮০ -এর গম মধ্যসাগর থেকে ফিরিয়ে নিলে বাংলাদেশে চরম দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়।সরকারের তরফ থেকে দুর্ভিক্ষাবস্থার অস্বীকৃতি ও চরম অব্যবস্থাপনার কারণে প্রায় ছয়লাখ মানুষ মৃত্যুবরণ করলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে।

এই অবস্থায় দুর্নীতি, চোরাচালান, নৈরাজ্য, প্রশাসনিক বিরোধিতা মোকাবিলায় বঙ্গবন্ধু শাসন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে সংসদীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি, জাতীয় ঐক্যের নামে সব দল বিলুপ্ত করে একটি জাতীয় দল গঠন, নির্বাচনের প্রার্থীতার ক্ষেত্রেও কেবলমাত্র জাতীয় দলের মনোয়নকেই একমাত্র বিষয় করা হয় এবং তিনি নিজেও আজীবনের জন্য রাষ্ট্রপতি হন।

বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের পাশাপাশি প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনেন।মহকুমাসমূহ ইতোমধ্যে জেলায় উন্নীত হয়েছে। জেলা সমূহে জেলা গভর্ণর নিয়োগ দিয়ে তাদের হাতে স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব অর্পণের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। তবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তার মূল টার্গেট ছিল উপনিবেশিক আমলের প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙ্গে সরকারি কর্মচারীদের জনপ্রতিনিধিদের অধীনস্ত করা। সরকারী কর্মচারী ও জাতীয় দল-যার নামকরণ করা হয় বাকশাল- তাতে যোগ দিতে বলা হয়।আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের সূচনা করার কথা তিনি ঘোষণা করেন সেটা হলো কৃষিক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক সমবায় ব্যবস্থার প্রবর্তন।এর আগে পাটসহ বৃহৎ শিল্পসমূহ জাতীয়করণ করা হয়েছিল। তবে বিভিন্ন সময় ব্যক্তি পুঁজির সর্বোচ্চ সীমা বাড়ানো হয়।

বঙ্গবন্ধু এই পরিবর্তনকে দ্বিতীয় বিপ্লব আর শোষিতের গণতন্ত্র বলে অভিহিত করেন। দলে দলে উৎসাহভরে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ বাকশালে যোগ দিলেও ইতোমধ্যে তিনি বাকশালের যে কমিটি ঘোষণা করেন তা তার পূর্বতন আওয়ামী লীগেরই প্রাধান্য ছিল।আওয়ামী লীগেরই সাড়ে তিনবছরে বারবার ঐক্য করার কথা বলে শেষ পর্যন্ত ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি গণতান্ত্রিক ঐক্য প্লাটফরম তৈরী হয়, তারা সরাসরি বাকশাল এ যোগ দিলেও বাকশাল কমিটিতেও তাদের বিশেষ স্থান হয়নি।

এই অবস্থায় জনগণ ও সরকার বিরোধীরা 'বাকশাল'-কে নতুন বোতলে পুরান মদ বলেই বিবেচনা করে। এবং এই শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনকে 'ফ্যাসিবাদী' ব্যবস্থা হিসাবে আখ্যায়িত করে। অন্যদিকে গ্রামীণ জোতদার মহাজন এমনকি মধ্য কৃষক বাধ্যতামূলক সমবায় ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেনি, বরং নিজেদের জমি হারানোর ভয় পেয়েছে, অন্যদিকে প্রশাসনের অভ্যন্তরে এবং বাঙালি ধনিকগোষ্ঠীর সমাজতন্ত্রের যে বিরোধিতা ছিল তা আরও তীব্র হয়।

বঙ্গবন্ধু এই পরিবর্তনের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে বারবার জোর দিলেও স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি ও ধর্মবাদী গোষ্ঠীরা একে 'ধর্মহীনতা' বলে প্রথম থেকে প্রচার করে।

এই রাজনৈতিক ডামাডোলে ষড়যন্ত্রের শক্তি বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করে। সামরিক বাহিনীর কিছু অফিসার ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে দেশে এক বড় ধরণের রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটায়। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক যে সেনাবাহিনীর সকল অধিনায়ক, পুলিশ প্রশাসন ও বেসামরিক প্রশাসন অতিদ্রুততার সাথে সেনাবাহিনীর ঐ ক্ষুদ্র অংশ আওয়ামী লীগের মন্ত্রী, বঙ্গবন্ধুর অতিঘনিষ্ঠ খন্দকার মোশতাককে বঙ্গবন্ধুর জায়গায় রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করলে, তার কাছে অতি অল্পসময়ের মধ্যে আত্মসমর্পণ করে।অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর লাশ তার পুরো পরিবারসহ ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে তার বাসভবনের পড়ে থাকা অবস্থায়ই বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীসভার চারজন সদস্য উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কর্তৃক পদচ্যুত তাজউদ্দিন আহমেদ, বাকশালের প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, শিল্পমন্ত্রী কামারুজ্জামান বাদে অন্যরা অপরাহ্নের মধ্যেই অভ্যুত্থানকারীদের সমর্থিত খন্দকার মোশতাক সরকারের মন্ত্রীসভায় যোগদান করে।

অপরদিকে আওয়ামী লীগের তরুণ অংশ, যারা মুক্তিযুদ্ধে প্রধান ভূমিকায় ছিল, তারা বিমূঢ় হয়ে যায়, আত্মগোপন করে, অথবা পরবর্তীতে গ্রেফতার হয়। দু'একটি জায়গা ছাড়া দেশের কোথাও কোন প্রতিবাদ বিক্ষোভ হয়নি।বরং যারা এতদিন বাকশাল ও বঙ্গবন্ধুর একান্তজন বলে পরিচিত ছিল তারা ভিন্নস্বরে কথা বলতে থাকেন। বঙ্গবন্ধু ইতোমধ্যে চারটি সংবাদপত্র ছাড়া সব সংবাদপত্র বন্ধ করে দিয়েছিলেন, সে সব সংবাদপত্রও অভ্যুত্থানের সমর্থনে দাঁড়ায়।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার উত্থান প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এর প্রেক্ষাপট বলতে এই দীর্ঘ বর্ণনা দিতে হল এই কারণে যে, ঐ রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রধান আঘাত এসেছিল বাংলাদেশের সংবিধান ও বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির উপর।খন্দকার মোশতাক ক্ষমতা গ্রহণ করে প্রথম যে বক্তৃতা করে তার শুরুই ছিল পাকিস্তান শাসকদের 'বিসমিল্লাহ' দিয়ে।সে

জাতীয় পোশাক হিসাবে ‘মোশতাক টুপি’ প্রচলনের উদ্যোগ নেয়।এমনকি সে যে নির্বাচনের পরিকল্পনা ঘোষণা করে তারও সময় বেছে নেয় মুসলমানদের পবিত্র ‘লায়লাতুল কদরের’ দিন।অপরদিকে সেনা অফিসারদের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি কর্নেল ফারুকের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত দলিলে তার দেওয়া বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির কারণেই তারা তাকে হত্যা করেছিল।

এরপর সেনাবাহিনীতে অভ্যুত্থান পাল্টা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে খন্দকার মোশতাক নিয়োগকৃত নতুন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণ শুরু করেন পাকিস্তানি সেনানায়কদের মত ‘বিসমিল্লাহ’ দিয়ে।আর মাত্র এক বছরের মাথাতেই সামরিক ফরমানে সংবিধানে যে সংশোধনী আনেন তাতে জাতীয় দল অর্থাৎ একটি মাত্র দল ‘বাকশাল’ বাদ দিয়ে বহুদলের প্রবর্তনের ঘোষণা দিলেও, তার ঐ সংশোধনী মূল বিষয়বস্তু ছিল সংবিধানের প্রস্তাবনায় ‘বিসমিল্লাহ’-র প্রবর্তন, চার মূলনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পরিপূর্ণ বিলোপ, সমাজতন্ত্রকে সামাজিক ন্যায়বিচার হিসাবে সংজ্ঞায়ন ও সংবিধানের নয় বিধিতে সাম্প্রদায়িকতার যে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা ছিল তার বিলোপ সাধন।জিয়াউর রহমান কি কারণে সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের নিষিদ্ধ করার ধারাকে পরিবর্তন করে নাই, বোঝা না গেলেও, তার জারীকৃত রাজনৈতিক দল নিবন্ধন (পিপিআর)-এর নীতিমালায় ধর্মভিত্তিক দল গঠনের সুযোগ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।অন্যদিকে ইতোপূর্বেই তার উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল তোয়াবের ঐ ধর্মভিত্তিক দলগুলো নিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যোনে ‘সীরাত সম্মেলন’ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়।অবশ্য মওলানা ভাসানীর কঠিন প্রতিবাদ ও হুঁশিয়ারিতে সেটা সম্ভব হয়নি।তবে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী দলগুলো প্রকাশ্যেই তাদের তৎপরতা শুরু করে। স্বাধীনতা বিরোধী ‘জামাতে ইসলাম’, ‘ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ’ (আইডিএল) পিপিআর এর অধীনে রাজনৈতিক দল হিসাবে নিবন্ধন নেয়।অন্য মুসলিম লীগসহ ধর্মবাদী রাজনৈতিক দলগুলোও নিবন্ধন লাভ করে।এদিকে জেলখানায় যে সকল স্বাধীনতা বিরোধী ব্যক্তি দালাল আইনে জেলে ছিল তাদের কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়। বাতিল করা হয় দালাল আইন।যেসব যুদ্ধাপরাধীর নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিল, তাদের নাগরিকত্ব পূণর্বহাল করা হয়।ঐ যুদ্ধাপরাধীদের পালের গোদা অধ্যাপক গোলাম আজম, যে সৌদী আরবে বসে পূর্ব পাকিস্তান পুণরুদ্ধার কমিটির প্রধান হিসাবে এযাবতকাল বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা পরিচালনা করছিল, তার অসুস্থ মাকে দেখার অজুহাতে দেশে ফিরে আসতে অনুমতি দেয় জিয়াউর রহমান। গোলাম আজম দেশে ফিরেই তার পাকিস্তানী পাসপোর্ট ছিঁড়ে ফেলে।এবং তার নাগরিকত্ব না থাকলেও নির্বিঘ্নে বাংলাদেশে অবস্থান করে জামাতসহ ধর্মবাদী গোষ্ঠী ও ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করতে থাকে।

সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের সংবিধান সংশোধনী-যা পরবর্তীতে ১৯৭৯ এর পার্লামেন্টের সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী হিসাবে অনুমোদন পায়-তাই বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মবাদী রাজনীতির মূল ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।আগেই বলা হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দ্বি-জাতিতত্ত্ব ও সাম্প্রদায়িকতার মর্মমূলে আঘাত করলেও তাকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারেনি। বাংলাদেশ পরবর্তীতে বাংলাদেশের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়কে ‘ধর্মহীনতা’ বলে ব্যাপক প্রচার, মুসলিম বাংলার শ্লোগান এসবই দেশে ধর্মবাদী রাজনীতি পুণরুজ্জীবিত করার প্রয়াস চলে।জিয়াউর রহমানের এই সাংবিধানিক পদক্ষেপ একে কেবল আনুষ্ঠানিক বৈধতাই দেয় নাই, রাষ্ট্রীয় পোষকতাও

প্রদান করে, উৎসাহিত করে।জিয়াউর রহমান তার ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে জনগণের মধ্যে সুপ্ত সাম্প্রদায়িক চেতনাকে ভিত্তি করে ‘ভারতবিরোধিতা’কে রাজনীতির মূল ভিত্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে। এটাও ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও মনোভাবকে আরও পল্লবিত করে।

জিয়াউর রহমানের নিহত হবার অল্পপরেই ক্ষমতা দখলকারী আরেক সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদ জিয়ার এই সাম্প্রদায়িক সংবিধান সংশোধনীকে আরও পাকাপোক্ত করে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীতে ইসলামকে ‘রাষ্ট্রধর্ম’ -এর মর্যাদা দেয়।জেনারেল এরশাদ তার শাসনের শুরু থেকেই মাদ্রাসাভিত্তিক সংগঠনসমূহের সাথে দহরম মহরম, পীরদের আস্তানায় ঘন ঘন গমন, নির্দিষ্ট মসজিদে নামাজ পড়বেন বলে স্বপ্নে দেখেছেন বলে প্রচার, ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙ্গা নিয়ে সে দেশে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয় তার সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু করার অপচেষ্টার মধ্যদিয়ে মানুষের মধ্যে এক ধরনের ধর্মবাদী ও সাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনাকে আরও আনুষ্ঠানিক রূপ দেয়।

এরশাদ বিরোধী নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় রাষ্ট্র পরিচালনা’র অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হলেও জামাতের সহযোগিতায় ক্ষমতায় আরোহণ করে বিএনপি ও খালেদা জিয়া ঐ সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে এগিয়ে নেন। তার প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় জামাত নাগরিকত্বহীন গোলাম আজমকে প্রকাশ্যে ‘আমীর’ নির্বাচন করলে তার বিরোধিতায় যুদ্ধাপরাধের বিচার ও গোলাম আজমের ফাঁসির দাবিতে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ঘাতক দালাল বিরোধী নির্মূল কমিটির আন্দোলন শুরু হলে খালেদা জিয়ার সরকার সোহরাওয়ার্দীর উদ্যানে গোলাম আজমের প্রতীকী বিচারে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলাও দেন।ইত্যেমধ্যে আন্দোলনের চাপে, গোলাম আজমকে গ্রেপ্তার করলেও সুপ্রীম কোর্টের রায়ের মাধ্যমে তাকে নাগরিকত্ব প্রদান ও কারাগার থেকে মুক্ত করে এবার প্রকাশ্যেই জামাতের স্বাধীনতা বিরোধী মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী তৎপরতার সুযোগ করে দেন।

জামাতের ধর্মবাদী রাজনীতির সাথে আপোস করতে আওয়ামী লীগও পিছিয়ে থাকেনি।আওয়ামী লীগ বিএনপির কয়েকটি উপ-নির্বাচনে চূড়ান্ত ভোট রিগিংকে ভিত্তি করে দলীয় সরকারের অধীনে নয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন নির্বাচন প্রদানের যে আন্দোলন শুরু করে তাতে জামাত ও জাতীয় পার্টিকে যুক্ত করে।আন্দোলন সফলতার মুখ দেখলে ছিয়ানব্বইতে যে নির্বাচন হয় তাতে আওয়ামী লীগ একইভাবে ধর্মকে তাদের প্রচারের উপজীব্য করে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী সকল পোস্টার হিজাব পরা শেখ হাসিনার মোনাজাতরত ছবিই মুখ্যত ব্যবহার করা হয়।নির্বাচনে জামাত তার মূলমিত্র বিএনপিকে ভোট দেয়ায় হাসিনার পক্ষে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা সম্ভব হয়নি।আওয়ামী লীগ নব্বইয়ের আন্দোলনের পরাজিত এরশাদ ও তার ’৮৮ এর ভোটারহীন নির্বাচনে নির্বাচিত বিরোধী দলীয় নেতা আ স ম রবের জাসদকে নিয়ে ‘ঐক্যমতের’ সরকার গঠন করে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ৮৬-এর এরশাদের আপোষের নির্বাচন বর্জনের মধ্যে দিয়ে গঠিত বাম পাঁচদল, '৯০ এর তিনজোটের আন্দোলনের ভিত্তিতে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানে অন্যতম মূখ্য ভূমিকা পালন ও বিএনপি-জামাতের সাথে আপোষ ও ধর্মবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার সোচ্চার থাকলেও আওয়ামী লীগ বিএনপির বিকল্প হিসাবে বিকল্প রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি দিয়ে দুইদলের সমদূরত্বে স্বতন্ত্র অবস্থান গ্রহণ করে।শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বাধীন ঘাতক দালাল নির্মূল আন্দোলন ও অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে সামনের সারিতে লড়াই করলেও '৯১-এর নির্বাচনে তাদের কয়েকটি আসন থাকলেও, '৯৬-এর নির্বাচনে গঠিত পার্লামেন্টে একটি আসনও পায়নি। বাংলাদেশে এই প্রথম কোন বামদলের পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব ছিল না।

একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গিয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার কাজ শুরু করতে সক্ষম হলেও, তাদের প্রতিশ্রুত বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যেতে পারেনি, সেটা পার্লামেন্টে তাদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় সম্ভবও ছিল না।তবে এই সময়কালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধর্মভিত্তিক দলগুলোকে তার পক্ষে রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন।মাদ্রাসা শিক্ষার বিপুল বিস্তার, মসজিদভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি ইতিমধ্যেই দেশে আধুনিক শিক্ষার মূলধারার বাইরে এক বড় সামাজিক শক্তির জন্ম দেয়, যা ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে জামাতের রাজনৈতিক ভিত্তিকে প্রসারিত করে।

এদিকে পৃথিবীতেও সত্তর দশকের শেষভাগ থেকে ইসলামিক রাজনীতির উত্থান ঘটে।ইরানের ইসলামি বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা, মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রো ডলারের পৃষ্ঠপোষকতা, ইসলামি অর্থনীতির প্রচলন ও সর্বোপরি আফগানিস্তানে তালেবান মুজাহিদদের ক্ষমতা দখল ও ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা- এসবই বাংলাদেশের ধর্মবাদী দল ও গোষ্ঠীকে উৎসাহিত করে।বাংলাদেশেও ধর্মবাদী রাজনীতির দ্রুত বিস্তার ঘটে।বড় দু'টি দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি তাদের সমর্থন লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে।

একইভাবে আওয়ামী লীগের শাসনামলে ভারতের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা, গঙ্গার পানি চুক্তিতে পানির কম হিস্যা গ্রহণ করে বাংলাদেশের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, পার্বত্য শান্তিচুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের এক দশমাংশ অংশকে ভারতের হাতে তুলে দেয়া এবং সর্বোপরি আওয়ামী লীগের 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র স্লোগানকে সেই পুরানো কায়দায় ধর্মহীনতার অভিযোগ তুলে বিএনপি-জামাত চার দলের ঐক্যের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তারা নির্বাচনে নিরংকুশ বিজয় লাভ করে। ঐ নির্বাচনের পিছনে বিচারপতি লতিফের তত্ত্বাবধায়ক সরকার, বিশেষ করে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ থাকলেও, আওয়ামী লীগ শাসনের দলবাজি, দুর্নীতি, দখলদারি ও এলাকাবিশেষে সন্ত্রাসী রাজত্ব কায়েমে জনগণ বিদ্বিষ্ট ছিল।এই সুযোগ নিয়েছিল চারদলীয় জোট।আওয়ামী লীগের এক নির্বাচনী পোস্টারে 'কুকুরের মাথায় টুপি'কে চারদল তাদের নির্বাচনী প্রচারে আওয়ামী লীগের ধর্মহীনতার প্রমাণ হিসেবে হাজির করে।চারদল কেবল নির্বাচনে বিজয় লাভ করেই ক্ষান্ত থাকে নাই, নির্বাচনের পরপরই ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সহিংস আক্রমণ ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের উপর আক্রমণ শুরু করে।দেশের বিভিন্ন স্থানে এই সাম্প্রদায়িক হামলায় হিন্দু-খৃষ্টান জনগোষ্ঠী চরম উৎপীড়নের সম্মুখীন হয়।বহু প্রাণহানি, হামলা, ঘরবাড়ী লুট ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটে।আওয়ামী লীগের কয়েক হাজার নেতা-কর্মী ঘরছাড়া-এলাকা ছাড়া হয়।

এই সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিরুদ্ধে পাঁচদল, যা ইতিমধ্যে বামফ্রন্টে রূপান্তরিত হয়েছে তারা দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করলেও আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য শক্তি সংগঠনের নির্বাচনোত্তর বিপর্যস্ত অবস্থায় সেভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি।তবে বিএনপি-জামাত চারদলের সরকারকে ঐ সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বন্ধে বাধ্য করতে সক্ষম হয়।

একানব্বইয়ের নির্বাচনে বিএনপি-জামাতের সহায়তায় সরকার গঠন করলে স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী গোষ্ঠী তার ছত্রছায়ায় তারা রাজনীতি, প্রশাসন, অর্থনীতিতে তাদের শিকড়ও বিস্তৃত করা শুরু করে।তাদের ছাত্র সংগঠন ছাত্রশিবিরকে দিয়ে তারা রাজশাহী বিশ^বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ^বিদ্যালয়, রংপুর কারমাইকেল কলেজ, বিভিন্ন মেডিক্যাল ও পলিটেকনিক্যাল ইন্সস্টিটিউটসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহিংসতার মাধ্যমে তাদের দখলদারিত্ব কায়েম করে।এই সহিংসতায় তাদের প্রধান ধরণ ছিল প্রতিপক্ষের চোখ তোলা, হাত-পা, রগকাটা ও গুলিবর্ষণ করা। তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের ছাত্রনেতা-কর্মীরা।কারণ তারা জানত আওয়ামী লীগকে বামপন্থীদের কবলমুক্ত করতে পারলে তারা বিএনপি'র ছত্রছায়ায় দেশের রাজনীতিতে একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারবে।তাদের ঐ সকল সহিংস আক্রমণে নিহত শহীদ জামিল আখতার রতন, রীমু চৌধুরী, দেবাশীষ রুপম, ফারুক, জুয়েলের নাম এখানে বিশেষভাবে স্মরণ করছি।তবে তাদের আক্রমণে আরও অসংখ্য বাম ও প্রগতিশীল নেতা কর্মীরা নিহত হয়, অনেকে হাত, পা, চোখ হারায় এবং তাদের বহু ছাত্রবাস অগ্নিদগ্ধ হয়।

এবার চারদলের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই স্বাধীনতা বিরোধী সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী গোষ্ঠীও মন্ত্রীত্ব লাভের মাধ্যমে সরাসরি ক্ষমতার অংশীদার হয়।ইতোমধ্যে পৃথিবীতে আরও পরিবর্তন ঘটেছে পাকিস্তানসহ মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ইসলামী জঙ্গীবাদী গোষ্ঠীর তৎপরতা গুরুতর রূপ লাভ করেছে।বাংলাদেশেও বিএনপি-জামাতের ছত্রছায়ায় হুজি, জেএমবি নামের প্রায় ১৯টি জঙ্গীবাদী গোষ্ঠী সংগঠিত তৎপরতা শুরু করে।রাজশাহী অঞ্চলে সিদ্দিকুর রহমান বাংলা ভাই ও শাইখ আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে জঙ্গীবাদী তৎপরতা বিশাল বিস্তৃতি লাভ করে।রাজশাহী, নাটোর, চাপাইনবাবগঞ্জ, গাইবান্ধা, সিলেট, জামালপুর, ময়মনসিংহে বাংলা ভাই, শাইখ আব্দুর রহমানের জেএমবি দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় ভাল ও কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।১৭ আগস্ট ২০০5 সনে মুন্সিগঞ্জ জেলা বাদে জেএমবি একযোগে একই সময় দেশের ৬৩টি জেলায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটনার মধ্য দিয়ে তাদের শক্তির প্রদর্শন ঘটায়।বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া এই জঙ্গিবাদী তৎপরতাকে 'মিডিয়ার প্রচারণা' বলে উড়িয়ে দিলেও, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাপে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তারা তাদের মৌলবাদী-জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়েনি।বরঞ্চ ২০০4 সালের ২১ আগস্ট 'হুজি'কে দিয়ে আওয়ামী লীগের জনসভায় বোমা বিস্ফোরণ করিয়ে শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বকে সমূলে বিনাশ করার উদ্যোগ নেয়।একুশে আগস্টের এই বোমাবর্ষণের ঘটনাকে ভিন্নখাতে ঘোরানোর জন্য তাকে ভারতীয় 'র'-এর কাজ বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা নেয়।তারা একুশে আগস্টের বোমা হামলার বিচারও করেনি।বরং 'জজ মিঞা' নাটক সাজিয়ে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার ও নির্যাতন করে।

২০০৬ সালে বিএনপি-জামাত বিরোধী ১৪ দলের আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছালে সেনা হস্তক্ষেপে বিএনপি-জামাত শাসনের অবসান ঘটলেও দুই বছরের সেনাশাসন বাংলা ভাইয়ের জেএমবি, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার মূল বিচারসহ জঙ্গিবাদী-মৌলবাদী তৎপরতা বন্ধে কিছু ব্যবস্থা নিলেও দেশে যে সাম্প্রদায়িক তৎপরতা ও মানসিকতার বিস্তৃতি রোধে কোন উদ্যোগ নেয়নি।বরং বাংলাদেশের সকল শাসকগোষ্ঠীর মতই দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকেই পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করেছে।

২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলের বিজয়ের মধ্য দিয়ে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাজনীতির ধারায় দেশ ফিরে আসে।কিন্তু যে আশা নিয়ে দেশবাসী বাহাত্তরের সংবিধানে পরিপূর্ণভাবে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করেছিল তা ঘটেনি।পঞ্চদশ সংশোধনীতে সংবিধানে চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি, সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞা পুনঃস্থাপিত করা হলেও, আওয়ামী লীগ বিশেষ করে তার নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ইচ্ছানুসারে সংবিধানের প্রস্তাবনায় জিয়াউর রহমান কর্তৃক সন্নিবেশিত 'বিসমিল্লাহ'কে ভাষান্তর করে অন্য ধর্মালম্বীদের বুঝ দেয়ার এবং একইভাবে এরশাদের প্রবর্তিত 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম'কে একইভাবে বহাল রেখে তাকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের গ্রহণযোগ্য করতে নতুন একটি বাক্য সংযোজন করা হয় যার মধ্য দিয়ে সকল ধর্মের সমঅধিকারের কথা বলা হয়।ওয়ার্কার্স পার্টি ও জাসদ সংবিধান সংশোধনী কমিটি ও সংশোধনী গ্রহণকালে বিভক্তি ভোটে ভিন্নমত লিপিবদ্ধ করলেও তার কোন প্রকাশ ঘটেনি সংবিধানের সংশোধনীতে।মাঠেও বাম রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন কোন কার্যকর জমায়েত বা আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারায় এ বিধানটি নির্বিঘ্নেই অস্তিত্ব বজায় রাখে।

সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতার সাংঘর্ষিক এই অবস্থান বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী রাজনীতির জটিল অবস্থাটাই তুলে ধরে।বামদের আশংকা সত্য পরিণত করে বরং এতে সমাজ ও রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক মানসিকতাই আরও পরিপুষ্ট হয়।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাহসের সাথে যুদ্ধাপরাধীর বিচার সম্পন্ন করতে সক্ষম হলেও, যুদ্ধাপরাধের ঐ বিচারকে চ্যালেঞ্জ করে জামাত দেশে এক চরম সহিংস পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।অন্যদিকে দেশে সরকারের নারী নীতি, শিক্ষানীতি, মুক্তবুদ্ধির চর্চার বিরুদ্ধে নতুন নামে হেফাজতে ইসলামের ছত্রছায়ায় সকল ধর্মবাদী দল সংগঠিত হয় এবং ৫ মে ২০১৩ সালে তারা রীতিমত অভ্যুত্থান ঘটাতে চেষ্টা করে- যাতে বিরোধী বিএনপি, জাতীয় পার্টি শরীক হয়।হেফাজতের ৫ মে'র ঐ সমাবেশ ও অভ্যুত্থান চেষ্টায় কিছু আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরাও যুক্ত হয়ে পড়েছিল।তবে শেষ মুহূর্তে আইন শৃংখলাবাহিনীর বলপ্রয়োগে তাদের শাপলা চত্বর থেকে হটিয়ে দেয়া সম্ভব হলেও ইতিমধ্যে বিশাল অঞ্চল জুড়ে অগ্ন্যুৎসব, লুটপাট ও ভাংচুরের ঘটনার সাক্ষী রেখে যায়। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ছিল আল জাজিরাসহ কিছু আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মানবাধিকার নামধারী কিছু সংগঠন একে ইসলামি রাজনীতি ও আলেম-ওলামাদের হত্যাকাণ্ড বলে মিথ্যা চিত্র ও বর্ণনায় ব্যাপক প্রচার করে।এর পরিণামে আওয়ামী লীগ দেশের প্রায় প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনে হেরে যায়।

ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ সরকার হেফাজতের সাথে সন্ধি স্থাপনে উদ্যোগী হয় এবং তার দলীয় কিছু নেতা ও সেনাবাহিনীর কর্মকর্তার মাধ্যমে তাদের দাবি মেনে নিয়ে পাঠ্যপুস্তকে তাদের ইচ্ছানুযায়ী সংশোধন আনে।নারীনীতি কার্যকর করা থেকে সরকার বিরত থাকে এবং সর্বশেষ হেফাজতের দাবি

অনুসারে কওমী মাদ্রাসার সর্বোচ্চ পরীক্ষা সনদ ‘দাওরায়ে হাদিস’কে স্নাতকোত্তর মর্যাদা প্রদান করে। অন্যদিকে কওমী মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ‘কওমী জননী’ উপাধি দেয়।কিন্তু এই সমঝোতা যে কত ঠুনকো ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে হেফাজতের বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভেঙে ফেলা এবং সর্বশেষ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঢাকা সফরকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভয়াবহ সহিংসতার ঘটনা ঘটানোসহ আরেকটা অভ্যুত্থান প্রচেষ্টায়। হেফাজতের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সরকার শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা নিলে এই অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার বিষয়টি বেরিয়ে এসেছে।অর্থাৎ হেফাজতকে যতই তোষণ করা হোক না হেফাজত তার মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে সরে আসেনি-আসবে না।আওয়ামী লীগসহ দেশবাসী যত দ্রুত এটা বুঝবে ততই মঙ্গল।

অন্যদিকে সিরিয়া-ইরাক সীমান্তে বিস্তীর্ণ জায়গা দখল করে আইসিএস-এর কর্তৃত্ব দখলের পর বাংলাদেশে জঙ্গিবাদী রাজনীতি নতুন রূপ নেয়। সরকার বৈশ্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশে কোন আইসিএস নাই বলে অস্বীকার করে চললেও বাংলাদেশের এক শ্রেণীর তরুণদের মধ্যে তা বিশেষ উন্মাদনা তৈরি করে।খেলাফত প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় তাদের কেউ কেউ দেশ ছেড়ে সিরিয়া-ইরাকে ‘হিজরত’ করে।অপরদিকে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে মুক্তিবুদ্ধি চর্চার ব্যক্তিবর্গ-লেখক-প্রকাশক-ব্লগার, যাজক, পুরোহিত, ভিন্ন মতাবলম্বী ইমামদের নৃশংসভাবে হত্যা করার উপর্যপুরি ঘটনা ঘটে। এর সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটে ২০১৬ সালের ২ জুলাই রমজান মাসের সন্ধ্যায় হলি আর্টিজান নামক রেস্টুরেন্টে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে দেশী-বিদেশী ব্যক্তিদের হত্যার ঘটনায়।আইনশৃংখলা বাহিনী অভিযান চালাতে গিয়ে নিজেরাও আহত-নিহত হয়।সর্বশেষে সেনাবাহিনী কমান্ডো অভিযান চালিয়ে আইসিএস সদস্যদের হত্যার মধ্য দিয়ে অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

হলি আর্টিজানের ঘটনার পরও ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময় অভিযান চালিয়ে আইসিএস-এর অনুসারীদের হত্যা ও গ্রেপ্তার অব্যাহত থাকে।সরকার এদের নাম দেন ‘নব্য জেএমবি’।অবশেষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে।আইসিএস, আল-কায়দা-ভারত, আনসার আল ইসলাম, জেএমবি, নব্য জেএমবি, আল্লাহর দল বিভিন্ন নামে এই সব সশস্ত্র জঙ্গি গ্রুপগুলোর অবস্থান এখনও রয়েছে।তথ্য যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারাভিযান চালিয়ে তারা উচ্চ, উচ্চ মধ্যবিত্ত, ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশুনা করা বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রিক্রুট করে।এদের প্রধান রিক্রুটিং কেন্দ্র অবশ্য দেশের মাদ্রাসাগুলো। সরকার এই ধর্মীয় জঙ্গিগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশের আইনশৃংখলা বিভাগে কাউন্টার টেররিজম ইউনিট খুলেছে।তারা সর্বদা এই জঙ্গি কার্যক্রম মনিটরিং করছে।

দেশে ইসলামি জঙ্গি তৎপরতা কমে এলেও ইতিমধ্যে মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক প্রচারণা, জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মানসিকতাও বিশালভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক প্রচারের মাধ্যম ওয়াজ ও ইসলামি জনসভাসমূহ।এসব ইউটিউব-এ প্রচার হয় এবং লক্ষ লক্ষ দর্শক পায়।লাইক ও শেয়ার পড়ে প্রচুর।

গত দশ বছরে বর্তমান অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সরকারের আমলেই দেশে কক্সবাজারে রামুর বৌদ্ধবিহার, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে হিন্দু মন্দিরসহ হিন্দুগ্রাম, ভোলাসহ বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক সহিংস ঘটনা ঘটে।এর বাইরে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা সৃষ্টির ঘটনা অহরহ ঘটে চলেছে। এর সর্বশেষ প্রকাশ ঘটে সুনামগঞ্জের শাল্লায় হেফাজতের নেতৃত্বে হিন্দুগ্রাম আক্রমণ, মন্দির-বিগ্রহ ভাংচুর, মারপিট ও লুটপাটের ঘটনায়। দুর্ভাগ্যক্রমে এসব ক্ষেত্রে হেফাজত বা ঐ জাতীয় ব্যক্তিরা নেতৃত্বে থাকলেও আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের মধ্য ও নিম্নস্তরের কর্মীরাও যুক্ত হয়ে পড়ে।জামাত-বিএনপি তো রয়েছেই।

অর্থাৎ উপমহাদেশের সর্বপ্রথম ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশে বর্তমানে যখন ঘোষিত অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সরকার রয়েছে সেখানে মৌলবাদ সাম্প্রদায়িকতার ক্রম বিস্তার ঘটছে।এই সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীদের মূল সংগঠিত দল জামাতে ইসলামি কোণঠাসা অবস্থায় পড়লেও তারা দ্রুত পুনঃসংগঠিত হচ্ছে।বিরোধী দল হিসেবে বিএনপি অকার্যকর হয়ে পড়েছে।বামসংগঠনসমূহের শক্তি ক্ষীণ, তারা বিভক্ত ও পরস্পরের সাথে বিচ্ছিন্ন।এই অবস্থায় একমাত্র শক্তিশালী দল হিসেবে আওয়ামী লীগ ও তার প্রধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শক্তভাবে ক্ষমতায় থাকলেও নির্বাচন ও ভোটের স্বার্থে তাদের বিভিন্ন সময় জামাত-হেফাজতের সাথে সমঝোতা, পৃথিবীব্যাপী ধর্মবাদী উত্থানের প্রেক্ষিতে তাদের নেতা-কর্মীদের মধ্যে তার প্রভাব- সব মিলিয়ে আওয়ামী লীগের মধ্যস্তরের নেতৃত্ব সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী ধ্যান ধারণা দ্বারা প্রভাবিত।বঙ্গবন্ধু যে আওয়ামী লীগ রেখে গিয়েছিলেন তার চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।আওয়ামী লীগের ঘোর সমর্থক বিশিষ্ট সাংবাদিক-কলামিস্ট আব্দুল গাফফার চৌধুরী তার সাম্প্রতিক লেখায় আওয়ামী লীগকে সেই প্রথম দিকের আওয়ামী মুসলিম লীগ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। শক্তি সামর্থ্য বিবেচনায় অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তির দুর্বল এই অবস্থানের কারণে বাংলাদেশে সামনের যে কোন পরিবর্তনে সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী শক্তির উত্থানের আশঙ্কা।এবং সেটা যেমন বাংলাদেশের জন্য তেমনি উপমহাদেশের জন্যও এক অন্ধকারময় ভবিষ্যত সৃষ্টি করবে।বাংলাদেশের আজ সকল অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন, শ্রেণী-পেশা, নারী ও ছাত্র-যুব সংগঠনের প্রধান কর্তব্য এই সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদের এই উত্থানকে প্রতিহত করা। বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থানকে সর্বাত্মকভাবে সুদৃঢ় করা।

॥ ৩ ॥

বাংলাদেশ যে রাষ্ট্রটিকে ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সেই পাকিস্তান রাষ্ট্র উপমহাদেশে ধর্মীয় রাজনীতির বাহক হিসেবে এখনও টিকে আছে কেবল নয়, পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধর্মীয় জঙ্গিবাদী তৎপরতা পাশের দেশ ভারত, এমনকি দেশ হিসেবে বাংলাদেশকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারতের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি ইসলামি জঙ্গি গোষ্ঠীর সন্ত্রাসী তৎপরতা সে দেশের শাসকগোষ্ঠীকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা সৃষ্টির সুযোগ দিচ্ছে, অপরদিকে বাংলাদেশেও গত তিন দশক থেকে যে জঙ্গীবাদী রাজনীতির উত্থান ঘটিয়েছে তারও সূত্র পাওয়া যায় পাকিস্তানে।পাকিস্তানের মাদ্রাসায় যেমন আফগানিস্তানের তালেবান তৈরী করেছে তেমনি বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মবাদী দলের

অর্থ ও মৌলবাদী ধ্যানধারণার সূত্র পাকিস্তানী এই সব মাদ্রাসা, ও তাদের ইসলামী জঙ্গীবাদী সংগঠনসমূহ।

সাতচল্লিশে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই জিন্নাহ সাহেব পাকিস্তানকে সর্বধর্মের মানুষের রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করলেও ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ তাদের পূর্বতন রাজনীতি হিসাবে পাকিস্তানকে মুসলিমদের আলাদা আবাসভূমি হিসাবে বিবেচনা করত।আর তাই জিন্নাহর মৃত্যুর অল্প পরেই রাজনীতির খেলায় সামরিক-বেসামরিক আমলারা পাকিস্তান শাসনের নির্ধারক হয়ে উঠলে তারা এই ইসলামী ঝান্ডাকে ক্ষমতার মূল হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা শুরু করে।পাকিস্তানে পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে যে বিস্তর ফারাক তার মধ্যে তারা ইসলামকেই ঐক্যের সূত্র হিসাবে হাজির করে পাকিস্তানের উভয় অংশে এই তাহাজিব তমদ্দুন প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়।তারপরও পঞ্চাশের প্রথমভাগ পর্যন্ত ইসলামের এই জিগির থাকার পরও কাদিয়ানী দাঙ্গার সময় পাকিস্তান জামাতের মওদুদীকে পর্যন্ত ফাঁসির আদেশ দিয়েছিল। কিন্তু নয় বছর পর ১৯৫৬ সালে গৃহীত সংবিধানে পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়।পাকিস্তানের রাষ্ট্র প্রধান পদে কোন অমুসলিম নাগরিককে নিয়োগ দেয়া হবেনা বলে বিধান করা হয়।

পাকিস্তানের এই ইসলামী প্রজাতন্ত্রই সেনা শাসকদের হাতে পড়ে বাংলাদেশকে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত করে।বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানের অখ-তা রক্ষায় তাদের একমাত্র শ্লোগান ছিল ‘ইসলাম’ যা বাংলাদেশের মানুষ গ্রহণ করেনি।১৯৭১ এর পাকিস্তান ক্রমাগত কট্টর ইসলামী দেশে রূপান্তর লাভ করতে থাকে।জুলফিকার আলীর ভুট্টোর হাত দিয়ে আহমদীয়া (কাদিয়ানী) সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়।জেনারেল জিয়াউল হকের আমলে ব্লাসফেমী আইন কেবল পাসই করা হয়নি, অমুসলিম তো বটেই, এমনকি মুক্তমনা মুসলিমদের এই আইনে বিচার করে ফাঁসি পর্যন্ত দেয়া হয়।জেনারেল জিয়াউল হকই পাকিস্তানকে তালেবান মুজাহিদদের ট্রেনিং অর্থ ও অস্ত্র সহায়তা প্রদান করে যার পরিণামে আফগানিস্তানে তালেবানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।এ ক্ষেত্রে পাকিস্তান ছিল মার্কিনীদের মিত্র।

সেই ধারাবাহিকতা এখনও চলছে।পাকিস্তানের জঙ্গীগোষ্ঠীগুলি বহুদিন ধরেই রাষ্ট্রীয় পোষকতা পেয়ে এসেছে।বেনজির ভুট্টো, নওয়াজ শরীফ, সেনা শাসক মোশাররফ ও সর্বশেষ ইমরান খান কেউই এই বৃত্ত থেকে বেরুতে পারেনি।পাকিস্তান কার্যত এখন একটি জঙ্গী রাষ্ট্র হিসাবে অবস্থান করছে।পাকিস্তান রাষ্ট্রে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেও সে দেশের শাসনে অঘোষিত সেনা নিয়ন্ত্রণ তাকে দাঁড়াতে দেয়নি, এখনও দিচ্ছে না।উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ বিস্তারের ক্ষেত্র হিসাবে অবস্থান করছে পাকিস্তান।

॥ ৪ ॥

উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ দেশ ভারত বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে দ্রুততার সাথে যে সংবিধান গ্রহণ করে, তাতে ধর্মনিরপ্রেক্ষতার বিধান সংযুক্ত না করা হলেও জওহরলাল নেহেরু প্রথম থেকেই ভারতকে একটি অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে ব্রতী হন। উপমহাদেশের বিভক্তি, বিশেষ করে পাঞ্জাব ও বাংলার বিভক্তি যে সাম্প্রদায়িক ক্ষতি ও শরণার্থী সমস্যার সৃষ্টি করে তাতে রাজনীতিতে একটি অসাম্প্রদায়িক বাতাবরণ তৈরী করা দুরূহ ছিল। তারপরও নেহেরুর কংগ্রেসসহ বাম প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক অপর সকল রাজনৈতিক দলসমূহ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির পতাকাই তুলে ধরে। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিল হিন্দু মহাসভা, জনসংঘ ও রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ। তারা কট্টর হিন্দুত্ববাদের কথা বলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত করতে সক্ষম হলেও রাজনৈতিকভাবে ভারতের জনগণ তাকে কখনও গ্রহণ করেনি।কিন্তু আশির দশক থেকে, হিন্দুত্ববাদের আবরণে যে সাম্প্রদায়িক উত্থান ঘটতে থাকে তার থেকে এমনকি নেহেরুর ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেসও এই প্রভাবের বাইরে থাকেনি।

বাবরী মসজিদ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে হিন্দুত্ববাদের যে জয়যাত্রা শুরু হয় তাই এখন ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতায় ভারতে ধর্মীয় বিভাজন রাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিণত করেছে। সিএএ ও এনআরসি ইতিমধ্যে এই ধর্মীয় বিভাজনকে আইনী রূপ দিয়েছে।সম্প্রতি পশ্চিমবাংলা ও আসাম রাজ্যে যে নির্বাচন হয়েছে তা হয়েছে এই ধর্মীয় বিভাজন নীতির ভিত্তিতে।পশ্চিম বাংলায় এই নীতি জয় লাভ করতে না পারলেও বড় মাঠ দখল করেছে।আর আসাম রাজ্যে কেবল মুসলিমরা নয় বাঙালি হিন্দুরাও চরম অনিশ্চয়তায়।

ভারতের উত্তর প্রদেশ, গুজরাট, কর্নাটকে গো-মাংস নিষিদ্ধ করণের পাশাপাশি তাকে কেন্দ্র করে হামলা-হত্যা, ভারতের গৌরব বিরোধী ধর্মবর্ণের বিয়েকে ‘লাভ জিহাদ’-এ নিষিদ্ধ করার মধ্যে দিয়ে ভারতের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তিকে বড় ধরণের পরীক্ষার সম্মুখীন করেছে।এটা স্বস্তির বিষয় যে শাহীনবাগ আন্দোলনের প্রতি জনগণের সক্রিয় সমর্থন, ছয় মাস ব্যাপী চলা কৃষকের আন্দোলন, শ্রমিক-কৃষক, পেশাজীবী মানুষের অভূতপূর্ব ঐক্য, করোনার ভয়াবহতার মধ্যে এক ধর্মের মানুষের প্রতি আরেক ধর্মের মানুষের সহনাভূতির হাত বাড়িয়ে দেয়া, ভারতের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী লড়াইকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ও ধর্মবাদী রাজনীতির উত্থান এখনও রুদ্ধ হয় নাই।ভারতকে তার অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক পথে ফিরিয়ে আনা সে দেশের গণতান্ত্রিক শক্তির সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসাবে উপস্থিত।সেটা তারা কতখানি এগিয়ে নিতে সক্ষম হবেন তা তাদের ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপের উপর নির্ভর করছে।

॥ ৫ ॥

উপমহাদেশের এই সাম্প্রদায়িক উত্থানের অভিঘাত প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর উপর রয়েছে।এক দেশের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি জোরদার হওয়া পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাম্প্রদায়িক অপশক্তিগুলোকে আরও উৎসাহিত ও শক্তিশালী করে। এদের বিরোধী ধর্মীয় অবস্থানের পরও সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদী রাজনীতির প্রশ্নে একটি ঐক্যসূত্র আছে। উপমহাদেশের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলোও তাই একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, পারস্পরিক ঐ ঐক্যের সূত্র খুঁজে বের করে তাকে সংগঠিত রূপ দিতে হবে। বাংলাদেশ তার পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত করেছে। ভারত-পাকিস্তানও স্বাধীন দেশ হিসাবে তাদের অস্তিত্বের ৭৫ বছর পূর্ণ করতে চলেছে।একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবী যখন তথ্যপ্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তথা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে প্রবেশ করেছে তখন উপমহাদেশে এই সাম্প্রদায়িক পরিচিতিকে দূর করে নতুন বিশ্বের আধুনিকতম দেশ ও সভ্যতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত (জুন, ২০০৯ সালে পুনর্মুদ্রিত) ও জনাব হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র-চতুর্থ খণ্ডঃ মুজিবনগরঃ প্রবাসী বাঙালীদের তৎপরতা"-পৃষ্ঠা নম্বর-৪৫৬

২. ভারতের পশ্চিম বাংলার কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'গণশক্তি' (সান্ধ্য দৈনিক)-২৮ জুন ১৯৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত (জুন, ২০০৯ সালে পুনর্মুদ্রিত) ও জনাব হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ সাক্ষাৎকার"-পৃষ্ঠা নম্বর -১৩৫

লেখক: জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির অন্যতম সংগঠক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং সভাপতি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি।